**মস্কোর বরফবিথী ও একজন সুতপা**

**পর্ব-১৩**

আজ সুতপা রুস্তভ ফিরে যাবে।

এই যাওয়াটা অন্যান্য বারের থেকে একদম আলাদা।

অপূর্ব -সুতপা দুজনের ভিতরেই একটা চিনচিনে ব্যথার টান লাগছে। সন্ধ্যা ৭.৩০ ফ্লাইট। বিকেল পাঁচটায় রওনা দিতে হবে। অপুর্ব ওকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাবে। তুহিন যেতে পারবে না বলে আগেই সুতপার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলো। আজ সকালে ইউনিভার্সিটি যাওয়ার সময় সুতপার সাথে দেখা করতে এসেছিল।

-তুমি সাবধানে যেও। আর গিয়ে আমার কথা ভুলে যেও না।

-না না ভাইয়া কি বলছেন। আপনাকে কি কখনো ভোলা যায়। চাইলেও ভোলা যাবে না। এই কয়টা দিন কিভাবে যে চলে গেল টেরও পাইনি। আপনাদেরকে পেয়ে খুব ভালো লাগছিল-সুতপার উক্তি।

-হুম! ঠিকই বলছো। আমারও খুব ভালো কেটেছে কয়েকটা দিন। তুমি তাড়াতাড়ি মস্কো চইলা এসো।

-চেষ্টা করছি ভাইয়া। অগাষ্টের মধ্যেই জানতে পারবো।

-যাক, তুমি ভালো থেকো। মন একদম খারাপ করবে না। আর এখন তো ফোন করার সুবিধা আছে।

এই বলেই তুহিন চলে যায়।

গতকাল ঘুরতে ঘুরতে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে

এমন শহর দেখা আর আগে কখনো হয়নি। অন্তত অপুর্বর। সারাটা দিন চসে বেড়িয়েছে মস্কোর কয়েকটি দর্শনীয় জায়গায়। ব্লকে যখন ফিরে আসে তখন রাত ৮টা।

মস্কো সত্যিই একটি আশ্চর্যজনক শহর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোড়া সারা শহরটি। কতো যে অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় স্থান রয়েছে তা চিন্তাতীত। এর বিল্ডিংগুলির জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্য থেকে শুরু করে সবুজ পার্ক এবং উদ্যান, মস্কো কখনই দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করতে ব্যর্থ হয় না।

সুতপা অবাক হয়েই সবকিছু দেখছিল। মাঝে মাঝে বলছিল--কি সুন্দর

তবে সামার এলেই সব কিছুতে যেন প্রান ফিরে আসে। এখন মার্চের শেষ সময়। চারিদিকে সাঁজানো ফুলের বাহারি ব্যঞ্জনা আর

সবুজ গাছের সৌন্দর্যের তানপুরার সুরে মুখরিত চারিদিক।

মার্চ এবং এপ্রিলে প্রথম যে জিনিসটি সবার নজর কাড়ে তা হল সুন্দর চেরি ব্লসম গাছ যা মস্কোর প্রায় প্রতিটি রাস্তায় সারিবদ্ধ। এই আইকনিক গাছগুলিকে প্রায়শই নতুন সূচনার প্রতীক হিসাবে দেখা হয়। বসন্তেকে রাঙিয়ে তোলে। প্রকৃতির প্রতিটি কোণে জাগিয়ে দেয় চাঞ্চল্যের প্রাঞ্জলতা। সূক্ষ্ম সাদা পাপড়িগুলি আশেপাশের সবুজের বিপরীতে এঁকে দেয় সুন্দর বৈপরীত্যের নকশী।

এই সময়ের বৈচিত্রই একটু আলাদা। মার্চের মাঝামাঝি থেকে রঙিন ম্যাগনোলিয়া গাছগুলিতে ফুল ফুটে। প্রাণবন্ত গোলাপী বা বেগুনি রঙগুলি রাস্তার কোণে আল্পনার ছোঁয়া বিলিয়ে যায়। এপ্রিকট গাছগুলি ফুলের তোরায় সাঁজিয়ে রেখেছে আশে-পাশের পথ জনপদ। সুগন্ধি, ফল-বহনকারী এই উদ্ভিদগুলি শহরের পার্ক এবং উদ্যান জুড়ে সত্যিকারের মন মাতানো আনন্দদায়ক দৃশ্য তৈরি করে। নানা ধরনের গাছের প্রজাতির খোঁজ মেলে মস্কো শহরটাতে। তার মধ্যে আছে এলমস, সিকামোরস, ম্যাপেল, ছাই গাছ এবং ওকস। অবশ্যই, বার্চ গাছের উল্লেখ না করে রাশিয়ান উদ্ভিদ সম্পর্কে কোন আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। এই লম্বা, সাদা ছালযুক্ত সুন্দরীগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে গভীর মৌনতায়। সামারের প্রচন্ড তাপের সূর্যের রশ্মি থেকে বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে ছায়াতলে এক দন্ডের জন্য হলেও। তবুও কখনো সখনো তাদের সূক্ষ্ম পাতার মধ্য দিয়ে আলোর কনা বিচ্ছুরিত হয়ে আছড়ে পড়ে কোন বাগান বা পার্কের সেটিংয়ে। সৃষ্টি করে নিখুঁত ব্যাঞ্জনা।

গতকাল খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সুতপা। হাত-মুখ ধুয়ে অপুর্ব আর তুহিনকে ডেকে তুলে।

এক সাথে ব্রেকফাস্ট করে পাশের ১নম্বর ব্লকে। শীত তখনও বেশ কন কনে। তবে সুর্য দেবী বেশ প্রচ্ছন্ন। নরম রোদের আলোতে

শিশির ভেজা ঘাসগুলি যেন আলমোড়া দিয়ে জেগে উঠছে। আশে পাশের গাছগুলিতে রোদের আলো আছড়িয়ে পড়ছে। বেশ তাজা তাজা লাগছিলো সকালটাকে।

সুতপা পড়েছিলো জিন্সের একটি প্যান্ট। সাদা আর লাল রঙের জ্যাকেট। হলুদ বর্নের একটি মাফলার জড়িয়ে নিয়েছে মাথা এবং গলা।

পা টিপে টিপেই হাঁটছিলে। রাস্তায় কোথাও কোথাও বরফ রোদে শান পাথর যেন।

মিখলুখায়া মাখলায়া থকে ১৪৪ নম্বর বাস ধরে সোজা ইগুজাপায়দনায়া মেট্রো স্টেশন।

তেমন ভীর অবশ্য তখন ছিলো না। সপ্তাহের এই অফিস সময়কালীন দিনগুলিতে বেশ লোকে লোকারন্য থাকে মেট্রো স্টেশনগুলি।

স্টেশনের অটোমেটিক মেশিনে পয়সা ঢেলে ভেতরে ঢুকলো। ভাড়া খুব কম। জন প্রতি মাত্র ৫ কোপেক। একবার ভেতরে ঢুকে সারা শহর পাতাল রেলে ঘুরা যাবে একই ভাড়ায়। শুধু বাইরে বেড় হয়ে আবার ঢুকতে চাইলে তখন ফের পয়সা মেশিনে দিতে হবে।

সুতপা কখনো মেট্রোতে উঠেনি আগে। এই প্রথম। তাই এসকেলেটরে পা দিতে খুব ভয় পাচ্ছিলো।

মস্কো মেট্রো স্টেশনগুলি শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দর। ভেতরটায় মোজাইকের অপরুপ কারুকাজ, মার্বেল দেয়াল, এবং অত্যাশ্চর্য চোখ

ধাঁধানো ঝাড়বাতিগুলি সকলের মন কাড়ে। কিন্তু যে জিনিসটি মস্কো মেট্রোকে অন্যান্য পাতাল রেল ব্যবস্থা থেকে আলাদা করে তা হল এর এসকেলেটর। খুব গভীর। উপর থেকে নীচে তাকালে অনেকে ভয় পেয়ে যায়। মাথা ঘুরতে থাকে। অপুর্বরও প্রথম দিকে তাই হতো। এসকেলেটরগুলি কেবল যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মের মধ্যে স্থানান্তর করার জন্যই ব্যবহৃত হয় না বরং দীর্ঘতম স্টেশন টানেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়। আরও চিত্তাকর্ষক বিষয় হল যে এই এসকেলেটরগুলির মধ্যে অনেকগুলি ৪০-৪৫ বছরেরও পুরাতন। কিন্তু এখনো খুব সচল। চলছে অনবরত, ক্লান্তিহীন ভাবে।

কোন কোন স্টেশনে এই এসকেলেটরগুলির সাথে জড়িয়ে আছে বিশেষ শিল্পকর্ম যা না দেখলে কারো বিশ্বাস হবে ন।

মায়াকোভস্কায়া স্টেশনে রয়েছে দুটি ডাবল-ডেক এস্কেলেটর। প্রতিটি ধাপ একটি ভিন্ন প্যাটার্নযুক্ত টাইল বা মোজাইক দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। রাশিয়ান লোককাহিনীর দৃশ্যে সজ্জিত টাইলসগুলি। মার্ক চাগাল এবং কাজির মালভিচের মতো বিখ্যাত শিল্পীদের শিল্পকর্মে চিত্রিত করা হয়েছে। এটা সত্যিই দেখার মত একটি দৃশ্য।

এখানে একটি কথা অবশ্যই বলা উচিত যে মস্কোর ভূগর্ভস্থ প্রাসাদগুলিতে ব্যাবহৃত এস্কেলেটরে শুধু আরোহণ বা উঠা-নামার জন্যই নয়, বরং মনে হবে সময়ের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে চলেছি।

সুতপাকে মস্কো মেট্রো সম্পর্কে অপুর্ব বলে চলছে। সুতপাও তন্ময় হয়ে শুনছে ওর পাশে বসে।

প্রিপারেটরীতে থাকা কালীন সময় রুশ ভাষার শিক্ষিকা এলিজাবেত ইভানবনা খুব সুন্দর করে রাশিয়ার নানা বিষয়ে পড়াতেন। তার মধ্যে মস্কোর মেট্রো ছিলো একদিনের টপিক। সেদিন ক্লাশ শেষে ছাত্রদেরকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন স্বচক্ষে পাতাল রেলের অভিজ্ঞতার জন্য। নিয়ে যান বেশ কয়েকটি স্টেশনে। তার মধ্য ছিলো কমসোমলস্কায়া, প্লোসাদ রিভিউলুৎসি, পার্ক পোবেডি, প্রসপেক্ট মীরা ও নভোস্লোবডস্কায়া। প্রায় চার ঘন্টা ঘুরেছিল সেদিন।

কমসোমলস্কায়া মস্কোর সবচেয়ে সুন্দর ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশনগুলির মধ্যে একটি। দেয়ালগুলো মার্বেল স্তম্ভ, অলঙ্কৃত ঝাড়বাতি এবং সিলিং ফ্রেস্কো দিয়ে সাজানো যা রাশিয়ার ইতিহাসের গন্ডোলায় ধীরে ধীরে নিয়ে যায়। স্টেশনের উভয় পাশে ৩০ মিলিয়নেরও বেশি কাচের টাইলস দিয়ে তৈরি দুটি বড় মোজাইক প্যানেল রয়েছে যা আলেকজান্ডার নেভস্কি এবং দিমিত্রি ডনস্কয়ের মতো সামরিক ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে।

নভোস্কোবডস্কায়া অবস্থিত আরেকটি শ্বাসরুদ্ধকর স্টেশন। এর নকশাটি ঐতিহ্যবাহী রাশিয়ান লোকশিল্পের মোটিফ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যেমন ফুল এবং প্রাণী এর হলওয়ে এবং প্ল্যাটফর্ম জুড়ে দেখা যায়। এই মেট্রো স্টেশনটিতেই পাভেল কোরিন

দ্বারা ডিজাইন করা একটি চিত্তাকর্ষক গম্বুজ দাঁড়িয়ে আছে - একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

সেদিন প্লোসাদ রিভিউলুৎসির ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য আর লাল গ্রানাইট দেয়াল সঙ্গে মহাজাগতিক থিম সহ পার্ক পোবেডি এবং প্রসপেক্ট মীরার দেয়ালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিল্প কর্মগুলি দেখে অপুর্ব বিস্ময়ে ফেটে পড়েছিল।

তুহিন হাত ধরে সুতপাকে এসকেলেটরে নিয়ে আসে। খুব ভয় ভয় লাগছিলো ওর। চোখ মুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছিলো।

মেট্রো রেলে চেপে সোজা ক্রেমলিনের রেড স্কয়ারে এসে নামে তিনজন। সারা রেড স্কয়ারের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে সারা সকালটা

কাটায়।

মস্কো রেড স্কোয়ার সবচেয়ে বড়ো পাবলিক স্কোয়ার। রাজনৈতিক এবং সামরিক বিক্ষোভ, কুচকাওয়াজ, মৃত্যুদন্ড এবং অন্যান্য বড় ইভেন্টের জন্য একটি বিশেষ স্থান হিসাবে শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।, এর বিশাল স্থাপত্য এবং দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত ল্যান্ডমার্কগুলির নৈকট্য এটিকে একটি জনপ্রিয় পর্যটক আকর্ষণ করে তুলেছে। এখানেই গভীর মমতায় শুয়ে আছে অক্টোবর বিপ্লবের নেতা, সোভিয়েত রাশিয়ার জনক ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

এখানে অবস্থিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভবন যেমন সেন্ট বেসিল ক্যাথেড্রাল, লেনিনের সমাধি, কাজান ক্যাথিড্রাল এবং রাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক যাদুঘর, ঘুরে ঘুরে ওরা দেখলো।

মস্কো রেড স্কোয়ারের সৌন্দর্যে সুতপা বিস্ময়ে বিভোর। ভাবতেও পারেনি এতো সুন্দর স্কয়ার।

খ্যাচ খ্যাচ করে জেনিত ক্যামেরায় অনেক ছবি তোলা হয়েছে। বেশীর ভাগ ছবিই অপুর্বর আর সুতপার।

সকাল গড়িয়ে দুপুরে পা দিলো। হাঁটতে হাঁটতে যেন রাস্তায় পড়ে থাকা জল ছিট ছিটে বাদামের খোচার মতো নেতিয়ে পড়ছে। ক্লান্তি মনে হচ্ছে। সুতপা পাশের একটি বেঞ্চে বসে পড়লো।

-আর ঘুরতে পারবো না। আগে পেট পুঁজা করে নেই। কি বলিস তুহিন-অপুর্ব তুহিনকে লক্ষ করে বললো।

-ঠিক বলছিস। আমিও টায়ার্ড হইয়া গেছি। সুতপাও সকালো ভালো কিছু খায় নাই-তুহিন সুতপার দিকে তাকিয়ে শেষ কথাটি বললো

-না না ভাইয়া, আমি ঠিক আছি।

-কচু ঠিক আছো। লজ্জা-টজ্জা পাইলে চলবে না। এতে তোমারই ক্ষতি-প্যাক করে সামনের সবগুলো দাঁত বেড় করে তুহিন হেসে উঠলো।

-চল চল, কথা না বাড়িয়ে আমরা হেঁটে ম্যাগডোনাল্ডসে খেতে যাই। সুতপা কখনো ঐখানে খায় নাই-অপুর্ব তাড়া দিল

-আমি কিন্তু চিকেন ছাড়া অন্য কোন মাংস খাবো না।-সুতপার আব্দার

-ঠিক আছে, তুমি তাই খাবে। আমি জানি-তুমি একেবারে খাস ব্রাহ্মণের মেয়ে-তোমার ঐসব চলবে কেন। -তুহিন ঠাট্টা স্বরে বললো।

অপুর্বর মুখে মিট মিটে হাসি।

কয়েক মাস আগেই প্রথম ম্যাগডোনাল্ডসের রেস্তোরা খোলা হয় মস্কোতে। ফার্স্ট ফুডের কন্সেপ্টে সারা মস্কো জুড়েই ছিল টান

টান উত্তজনা। জানুয়ারীর ৩১ তারিখ ১৯৯০তে যখন প্রথম খোলা হয় সেদিন প্রায় দুই মাইল লম্বা লাইন ছিলো।

খোলার এক সপ্তাহ পরেই অপুর্ব সহ কয়েকজন বন্ধু এখানে খেতে আসে। সেদিনও খুব লম্বা লাইন ছিলো। খাবার নিতেই প্রায় এক ঘন্টা কেটে যায়। বাইরে খুব বৃষ্টি ছিলো তার মধ্যেই ছাতি মাথার উপর ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো। কোন উৎসাহের ভাটা নেই। এক ধরনের উচ্ছ্বাস ছিলো ফার্স্ট ফুড খাওয়ার।

সেদিন ম্যাকডোনাল্ডে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সত্যিই ছিল উপভোগ্য।

রেস্তোরাঁর পরিবেশ ছিল উত্তেজনাময় এবং নতুন অভিজ্ঞতায় রোমাঞ্চিত হয়েছিল সকলে।

মেনুতে হ্যামবার্গার, ফ্রাই, এবং আরও অনেক কিছুর মতো ফাস্ট-ফুডের পছন্দের সব ধরণের খাবার ছিলো। তুলনামূলকভাবে দামও আহামরি কিছু না। সকলেরই সাধ্যের মধ্যে। খুব আধুনিক ভাবে তৈরী করা হয়েছে এই রেঁস্তোরাটি সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ অন্তে।

আধুনিক নকশায় তৈরী কাঠের সাজসজ্জার সাথে ঐতিহ্যগত রাশিয়ান শৈলীর একটি যাদুকরী স্পর্শ ছিল চারিদিকে। সকল কর্মীরাও অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। মুখে হাসি দিয়ে উষ্ণভাবে স্বাগত জানায় সকল কাষ্টমারদের। অপুর্বর নজরকাড়ে কাউন্টারের সামনের কটি লেখা-ইংরেজী এবং রাশিয়ান ভাষায় লেখা। লেখা ছিলো উলিবকা বেশপ্লাতনা (হাসি দিতে পয়সা লাগে না)। সত্যিই

ওদেরকে দেখে তাই মনে হচ্ছিলো। হাসিতে এতোটুকু কৃপনতা নেই। তাছাড়া এই ধরনের রেস্টুরেন্টের ধারণাটি রাশিয়ায় তখন সম্পূর্ণ নতুন ছিল।

রেড স্কয়ারের পাশেই ম্যাকডোনাল্ডটি। তাই হেঁটেই রওনা দিল।

খাওয়া দাওয়াকরে আবারো ট্রেন ধরে রওনা দিলো।

ভিতরে ঢুকেই তুহিন সুতপাকে বললো-

-হাত ধরবে, নাকি একা একা চেষ্টা করবে?

-এবার পারবো ভাইয়া-এ বলেই সুতপা পা বাড়ায়।

সাথে সাথেই হুমরি খেয়ে পড়ে সামনে দাঁড়ানো অপুর্বর গায়ে। অপুর্ব দুহাতে ধরার চেষ্টা করে

-ঠিক আছে, ডোন্ট অরি।-অপুর্ব সুতপাকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করে। সুতপার মাথায় পেঁচানো মাফলারটি অপুর্বর মুখে আছড়িয়ে পড়ে।-সরি-এ বলে সুতপা মাফলারটি সরিয়ে নেয়। একটু লজ্জার আবেশ চোখে-মুখে ধরা দেয়। তবে সামলিয়ে নেয়।

আসার পথে মেট্রো ইউনিভারসিতাতে নেমে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি সহ আশে পাশের মনোরম সুদৃশ্য সবুজে ঘেরা বাগান আর

পার্কটি ঘন্টা খানেক ঘুরে দেখে।

রুমে যখন ফিরে আসে তখন প্রায় ৮টা।

তুহিন বললো-

-তোরা হাত মুখ ধুয়ে রেস্ট নে। ৭টার দিকে স্তালোভায়ায় গিয়ে খেয়ে আসবো।

-না ভাইয়া। আজ স্তালোভায়ায় যাবো না। আমি বরং রান্না করি। রুমে চিকেন আছে। সাথে একটু ডাল করবো আপনারা বরং গল্প

করেন।-সুতপা অপুর্বর দিকে তাকিয়ে থাকে

-না না, তা কি করে হয়। রান্না করার আইডিয়াটা খুবই দারুন। তবে আমরা সবাই এক সাথে রান্না করবো-অপুর্ব খুশি মনে বলে।

-তোরা যা, আমি এখনি আসছি-এ বলে তুহিন তার রুমের দিকে দৌড় দিলো।

প্রায় ১০টায় সুতপাকে রুমে রেখে অপুর্ব ও তুহিন বেড়িয়ে যায়।

সকালে উঠেই সুতপা ওর ব্যাগটা গুছিয়ে রেখেছিলো। আজ আর কোথাও যায়নি। দুপুরে দুজনে ১০ নম্বরের বুফেতে খেতে যায়।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় ওরা এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রুম থেকে বেড়িয়ে পড়ে। সামনেই একটা ট্যাক্সী পেয়ে গেল। গাড়ীরপেছনে ব্যাগটা রেখে দুজনেই পেছনের সিটে বসে পড়লো।

হঠাৎ করেই অপুর্বর মনটা কেমন ছ্যাত করে উঠলো। সাগরের উন্মাদ ঢৈউয়ের মতো বুকের ভেতরটা আথালি পাথালী করে উঠলো।

খুব ভীষনকষ্ট পাচ্ছিলো। সকাল পর্যন্তও বুঝতে পারেনি পরিস্কার নীল আকাশ ভরে উঠবে ভারী কালো মেঘে। এখনই বুঝতে পারলো কেউ চলে যাচ্ছে, কিছুটা দুরে। বিদায়ের বেদনায় অপুর্বর হৃদয় যেন আবেগ এবং দুঃখে ভরা। বাইরের হীরের টুকরোর মতো স্বচ্ছ রৌদ্রকে কেমন ফ্যাকাসে লাগছিলো। খুব অস্থির মন। পাশে নিশ্চুপ সুতপা কোন শব্দ নেই।

হঠাৎ সুতপার দিকে তাকাতেই অপুর্ব অবাক হলো-

-সুতপার দুচোখের কোন থেকে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে চিবুক বেয়ে ঠোঁটে-মুখে।

বুকটা ওর ছ্যাৎ করে উঠলো। কান্না পাচ্ছিলো। কোন রকমে নিজকে সংবরন করলো।

-তুমি কাঁদছো কেন? আরতো কয়েকটা মাস। সেপ্টেম্বরে তো মস্কোই চলে আসছো-অপুর্ব সুতপাকে সান্তনা দেয়।

-এখনো তো কিছু হলো না। তুমি কিন্তু সব ব্যবস্থা করবে। আমি আর রুস্তভে থাকতে পারবো না। আমার ভালো লাগে না।

-ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন আর মন খারাপ করো না।

-তুমি কিন্তু জুনে রুস্তবে আসবে পরীক্ষার পর। বলো আসবে-সুতপার অনুনয়

-কথা দিলাম। আমি যাবো। এখন না হয় একটু হাসো। যাবার সময় মন খারাপ করতে নেই।

-নাহ্, এই বলে সুতপা অপুর্বর কাঁধে তার মাথাটি আলতো করে রাখে। অপুর্ব আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

ঠিক সময়েই এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছে। সুতপাকে ভেতরে দিয়ে অপুর্ব ডিপার্চার গেইটে দাঁড়িয়ে থাকে। সুতপা ব্যাগটা দিয়ে

ইমিগাশনের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ করে সুতপা দৌড়ে এসে অপুর্বকে একটা চার ভাঁজ করা চিরকুট এগিয়ে দিয়ে বললো-

-এখন খুলবে না। রুমে গিয়ে পড়বে। তুমি ভালো থেকো

কিছু বলার আগেই সুতপা লাইনে ফিরে গেলো।

এক সময় ইমিগ্রেশন শেষ করে সুতপা হাত নাড়িয়ে ভেতরে চলে গেল।

এক বিষাদের জগদ্দল পাথর যেন অপুর্বর বুকটাকে পিষে মারছে। একদিকে কষ্ট যেন চেপে ধরছে, হৃদপিন্ডটা ছিড়ে আনতে চাইছে গোলাপ ছেঁড়ার মতো। আর অন্য হাতে তখন সুতপার দেওয়া চিরকুটটা। কি রিখেছে সুতপা? কি লেখা ওতে? ভাবতে ভাবতে সময় চলতে থাকে, অপূর্বও সমান্তরালে।

**(চলবে---)**

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট